অনুরণন

Anuranan: An International Peer-reviewed Journal of Humanities and Social Sciences

ISSN 2347-8055
Vol. 11 - 2023

স্যার আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ঃ রসায়ন শাস্ত্রে বিচরণ এবং এর মাধ্যমে সত্যের অনুসন্ধান তথা মানবতার মুক্তি

অনিল কৃষ্ণ সানা
প্রভাষক (বাংলা) রাজাপুর টেকনিক্যাল এন্ড বিএম কলেজ,
রাজাপুর,ঝালকাঠি,বাংলাদেশ

Anuranan: An International Peer-reviewed Journal of Humanities and Social Sciences
Vol. 11 originally published online November 2023

The online version of this article can be found at: http://www.arunananjournal.org/

Published by
অনুরণন
www.anurananjournal.org

Additional services and information for
Anuranan: An International Peer-reviewed Journal of Humanities and Social Sciences can be found at:

About the Journal: http://www.anurananjournal.org/about-us/
Editorial Board: http://www.anurananjournal.org/editorial-board/
Submission Guidelines: http://www.anurananjournal.org/submission-guidelines/
Contact: http://www.anurananjournal.org/contact-us/

© 2023 Anuranan: An International Peer-reviewed Journal of Humanities and Social Sciences

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Vol.11 : 2023 | **ISSN 2347-8055**

স্যার আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ঃ রসায়ন শাস্ত্রে বিচরণ এবং এর মাধ্যমে সত্যের অনুসন্ধান তথা মানবতার মুক্তি

অনিল কৃষ্ণ সানা
প্রভাষক (বাংলা) রাজাপুর টেকনিক্যাল এন্ড বিএম কলেজ, রাজাপুর,ঝালকাঠি,বাংলাদেশ

সংক্ষিপ্তসার

আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় কেবল একজন প্রখ্যাত রসায়নবিদ ছিলেন না,তিনি দার্শনিক ও একজন আদর্শ ও দরদী শিক্ষক ছিলেন। তিনি একজন স্বদেশী ও দেশহিতৈষী ব্যক্তি ছিলেন। দেশকে পরনির্ভরশীলতার হাত থেকে রক্ষার জন্য চেষ্টা করছেন। দেশবাসীকে আত্মনির্ভরশীল করার জন্য তিনি দেশে শিল্প স্থাপনে উদ্যোগ নেন। সর্ব প্রথম তিনি ১৮৯২ সালে বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কস স্থাপন করেন। দেশ ও দেশবাসীর প্রতি ছিল তার দায়বদ্ধতার অনুভূতি। সেই দায়বদ্ধতার উপর ভিত্তি করে তিনি দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে বহু মানুষের কর্মসংস্থান করেন। দেশবাসীর অন্তরে সাহস যুগিয়ে তিনি নিজেও পরিতৃপ্তি লাভ করেন। রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক পিসি রায় ১৮৯৫ সালে মারকিউরাস নাইট্রাইট নামক যৌগিক পদার্থ আবিষ্কার করে খ্যাতি লাভ করেন এবং তাকে নাইট্রাইটস বলা হতো। রসায়নের গবেষণা বৃক্ষ পুষ্প পল্লবে বিকশিত হয়েছে আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের হাতে। বাঙালি বিজ্ঞানী হিসেবে তিনি বাঙালি জাতির গর্ব। তিনি সব সময় চেয়েছিলেন বাঙালি জাতির আত্মোন্নতি। তার সাধনার বেদিমূলে ছিল বাঙালির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করা।

ভূমিকাঃ

আধুনিক ভাবনায় সমৃদ্ধ বিজ্ঞান সাধক প্রফুল্ল চন্দ্র রায় ছিলেন সম্ভাবনাময় মাঙ্গলিক সম্পূর্ণতার গুণ-শ্রীমান ধারক,পালক,সংরক্ষক।তিনি ছিলেন আদর্শবান লোক শিক্ষক। যার আদর্শ ছিল মানব কল্যাণ,মানব মনের উন্নতি। সামাজিক মনন দীনতাকে নিঃশেষ করে দেওয়ার জন্য তিনি সর্বদা শপথবদ্ধ ছিলেন।বাঙালি জাতিকে দাসত্বশৃঙ্খল ৎেকে মুক্তির অভয়ারণ্য সৃষ্টি করার প্রয়াসে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। বাঙালি যুবককে ব্যবসায়ী ও শ্রমজীবী করার জন্য নানা ব্যবসা ও নব নব শিল্পপ্রতিষ্ঠান তৈরীর পথ প্রশস্ত করে গেছেন। বাঙালি জাতিকে শিক্ষা অর্জনের পাশাপাশি কর্মে প্রবৃত্ত হবার জন্য তিনি দিকনির্দেশনা দান করেছিলেন। সারাজীবন রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যয়ন,অধ্যাপনা এবং গবেষণা নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও সত্যের সন্ধানে তিনি আত্মনিমগ্ন ছিলেন আর সেই সত্য ছিল মানবতার মুক্তি ও মনুষ্যত্বের বিকাশ। নানা কারণে মানুষের মধ্যে বিভেদ তাকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল তাই সৌভ্রাতৃত্বের উপর তিনি অধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি শিল্পের সঙ্গে কৃষির ও গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি বলতেন যারা উচ্চ শিক্ষা গ্রহন করেন তারা বাস্তব জীবনে কর্মহীন হয়ে পড়েন কারণ শিক্ষা অর্জন করতে গিয়ে মেধা,বোধ এবং চেতনা শক্তি হারিয়ে কর্মহীন হয়ে পড়ে। এর ফলে যা ঘটে তা হলো অর্থ উপার্জনের অপমৃত্যু।

তার ধারণা ছিল উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তির চেয়ে অল্প শিক্ষিত ব্যক্তিরা জীবন সংগ্রামে এগিয়ে যায়। মূলত তার বড় হওয়ার পিছনে ছিল তার অদম্য ইচ্ছা শক্তি। তিনি সব সময় সাদাসিধা জীবনে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি বিলাস-ব্যসন,নামী আসন আর দামী পোশাকের প্রতি কখনও আকৃষ্ট ছিলেন না। তিনি অপচয় কারীকে কখনও পছন্দ করতেন না। সমাজমনস্ক ও কর্মবীর আচার্য রায় বাহ্যিক চেহারায় শীর্ণকায় হলেও কি হবে,হোক পাতলা গড়নের তাতে কি,কাজের উৎসাহ উদ্দীপনায় লক্ষ জনতার মাঝেও তিনি স্বকীয় ঔজ্জ্বল্যে ভাস্বর ছিলেন।

পূর্ব পুরুষের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ঃ

পি,সি,রায় ছিলেন জমিদার পরিবারের সন্তান। তার পিতার নাম ছিল হরিশ্চন্দ্র রায়। তিনি ছিলেন একজন সমাজ সংস্কারক ও বিদ্যাসাগরের বন্ধু। তার মাতার নাম ছিল ভুবনমোহিনী দেবী। হরিশ্চন্দ্র ছিলেন পড়তি জমিদার কারণ তিনি ছিলেন প্রজাবৎসল,প্রজাদের সুখে দুঃখে পাশে থাকতেন, খাজনা মওকুফ করতেন। হরিশ্চন্দ্রের পিতা তথা আচার্যের পিতামহ ছিলেন আনন্দ লাল রায়। পিতামহ তার পিতাকে কৃষ্ণনগর স্কুলে ভর্তি করেন, সেখানে তিনি ফারসী, সংস্কৃতে ইংরেজিতে ঋদ্ধ হন। হরিশ্চন্দ্রের ছেলে মেয়েদের নাম ছিল জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র, নলিনীকান্ত, প্রফুল্ল চন্দ্র, পূর্ণচন্দ্র, বুদ্ধদেব, ইন্দুমতি ও বেলামতি। বুদ্ধদেব ও বেলামতি অকালে মারা যায়। হরিশ্চন্দ্র ১৮৫০ সালে গ্রামের বালিকাদের লেখাপড়ার জন্য তার স্ত্রী ভুবনমোহিনীর নামে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন।তার প্রপিতামহ ছিলেন মানিক লাল।প্রচুর বিত্ত বৈভবের মালিক ছিলেন।

জন্ম ও স্কুল জীবনঃ

পি,সি,রায়ের জন্ম ১৮৬১ সালের ২রা আগষ্ট। বর্তমান খুলনা জেলার পাইকগাছা উপজেলার রাড়ুলী গ্রামে তার জন্ম। জমিদার পরিবারে তার জন্ম। তার প্রপিতামহ ও পিতামহ ছিলেন ধনবান। যেন সোনার চামচ মুখে নিয়ে তার জন্ম। যদিও পিতার জমিদারি কিছুটা পড়তি ছিল। তার পিতার উপার্জন কিছুটা কমে গেলেও অভাব তাকে কোন দিন তাকে স্পর্শ করে নি। রক্ত আমাশয়ের কারণে তার শারীরিক অবস্থা খুব একটা ভাল ছিল না। হজমের সমস্যা ছিল,ছিল ঘুমের সমস্যা। গ্রামের স্কুলে তার প্রাথমিক শিক্ষার হাতেখড়ি হয়। এর পর তিনি তার পিতামাতার সাথে কলকাতায় চলে আসেন। প্রফুল্ল চন্দ্রের পিতা ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার আমহার্স্ট স্ট্রিটে একটি একতলা বাড়ি ভাড়া করে পুত্রদের উন্নত লেখাপড়ার জন্য নিয়ে আসেন। এখানে হেয়ার স্কুলে ১৮৭১ সালে তিনি ভর্তি হন। পিতামাতা ছাড়াও আরও অগ্রজ দুই ভাই এখানে এসেছিলেন। কিন্তু বছর দুই পার হতে না হতেই ১৮৭৪ সালে যখন তিনি চতুর্থ শ্রেণিতে পড়েন তখন রক্তামাশায় রোগে আক্রান্ত হন। ব্যাধি এতটা কঠিন ছিল যে তিনি মায়ের হাত ধরে গ্রামের বাড়িতে ফিরে আসেন। প্রায় দুই বছর শিক্ষা বিরতির পর ১৮৭৫ সালে পুনরায় কলকাতায় যেয়ে কেশব সেনের এ্যালবার্ট স্কুলে পুনরায় তৃতীয় শ্রেণিতে ভর্তি হন। এই স্কুলে ১৮৭৯ সালে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে বিদ্যাসাগর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন কলেজে এফএ ভর্তি হন এবং দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। একই প্রতিষ্ঠানে তিনি বিএ ভর্তি হন কিন্তু সেখানে পদার্থ বিজ্ঞান ও রসায়ন পড়ানো হতো না তাই বহিরাগত ছাত্র হিসেবে প্রেসিডেন্সি কলেজে গিয়ে রসায়নের ক্লাস করতেন। রসায়নের প্রফেসর আলেক জান্ডার পেডলারের চমৎকার রসায়ন শাস্ত্রের

বুঝানোর কৌশল তাকে রসায়নের প্রতি আকৃষ্ট করে। গিলক্রিস্ট বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে উচ্চ শিক্ষার জন্য ইংল্যান্ড গমন করেন। এর ফলে তিনি ইউরোপীয় শিক্ষা সংস্কৃতির সাথে তিনি নিজেকে যুক্ত করার সুযোগ পান। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডের এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিএসসি ভর্তি হন। তার লালিত স্বপ্ন রসায়ন পড়ার বিষয় টি আরও পাকাপোক্ত হয়। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে বিএসসি ডিগ্রি লাভের পর তিনি ডক্টরেট ডিগ্রির জন্য গবেষণা শুরু করেন। দুই বছরের মধ্যে তিনি ডক্টরেট অব সায়েন্স ডিগ্রি লাভ করেন। ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিএসসি ডিগ্রি লাভ করেন এবং এই ডিগ্রি লাভ করার জন্য ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে "হোপ প্রাইস' বৃত্তি লাভ করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিক্যাল সোসাইটির ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। উচ্চ শিক্ষা শেষে ১৮৮৮ সালে তিনি দেশে ফিরে আসেন।

বর্নাঢ্য কর্মজীবন, গবেষণা ও আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানঃ

বৃটিশ রাজত্বে উচ্চ শিক্ষা এবং গবেষণা সম্পন্ন ভারতীয়দের তেমন কোন কদর ছিল না। সে সময় উচ্চ পদে আসীন হওয়ার মত সুযোগ ভারতীয়দের ছিল না বলেই চলে। ইন্ডিয়ান এডুকেশনাল সার্ভিসের সবগুলো চাকরী তখন বৃটিশদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। কলেজে পড়ানোর জন্য কিছু চাকরি ভারতীয়দের জন্য বরাদ্দ থাকলেও তার বেতন ছিল নঘন্য। আচার্য রায়ের অবস্থা তখন ভাল যাচ্ছিল না। বাবার জমিদারী তখন দেনার দায়ে ফতুর হতে বসেছে। বাধ্য হয়ে তিনি জগদীশ চন্দ্র বসুর বাড়ীতে থেকেছেন এক বছর। রাসায়নিক গবেষণা চালিয়ে যাওয়ার মত সঙ্গতি ছিল না। এই পরিস্থিতিতে ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে জুলাই মাসে মাত্র ২৫০ টাকার বেতনে রসায়নের অস্থায়ী প্রফেসরের পদে প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনার চাকুরীতে যোগদান করে কর্মজীবন শুরু করেন। পরবর্তীতে রসায়নের অধ্যাপক হিসেবে সাতাশ বছর ধরে প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনা করেন। শিক্ষক হিসেবে তিনি ছিলেন অসাধারণ। তার ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই পরবর্তীতে খ্যাতি লাভ করেছেন। তিনি মুখস্থ বিদ্যা নয় হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়ার প্রতি যত্নবান ছিলেন। তিনি ছাত্রদের রসায়ন বিষয়টি এমন ভাবে শিখিয়ে দিতেন যে তা কাজে লাগানো যায়, গবেষণা করে নতুন জ্ঞানের পথ উন্মোচন করা যায়। তিনি চাকরীর জন্য না ঘুরে নিজে নিজে স্বয়ং সম্পূর্ণ হওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। বাঙালিরা লেখাপড়া শিখে শিল্পোদ্যোক্তা হয়ে উঠুক তার চেতনায় এই বিষয়টি ভর করে ছিল। তাই তিনি নিজের ভাড়া বাড়ীতেই ছোট পরিসরে গড়ে তোলেন গবেষণাগার। যেখানে দেশীয় কাঁচামাল ব্যবহার করে অনেক ধরনের প্রয়োজনীয় ঔষধ তৈরী করতেন। সেই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা থেকে তিনি গড়ে তোলেন "বেঙ্গল কেমিক্যাল এ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যালস ওয়ার্কস'। ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি "মারকিউরাস নাইট্রাইট' আবিষ্কার করে বিজ্ঞান জগতে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেন। ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে লন্ডনের প্রসিডিংস অব কেমিক্যাল সোসাইটিতে এই গবেষণা পত্র প্রকাশের পর বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেন। তারপর আর তার গবেষণা পিছনে ফিরে তাকায় নি। বিশ বছরে উল্লেখ করার মত প্রায় সত্তর টি গবেষণা পত্র প্রকাশ করেন। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে বেঙ্গল কেমিক্যাল কে লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তর করেন।১৯০৩ সালে পিতা হরিশ্চন্দ্রের নামে আর.কে.বি.কে হরিশ্চন্দ্র ইনস্টিটিউশন প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে জন্মস্থান রাড়ুলিতে " রাড়ুলি সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে "বেঙ্গল কেমিক্যাল সমবায় সমিতি ', ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে " বঙ্গবাসী কলেজ কো-অপারেটিভ স্টোর এণ্ড ক্যান্টিন ',১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে ১৯২ টি কলেজের

ছাত্রদের সমন্বয়ে আয়োজন করেন স্টুডেন্টস কো-অপারেটিভ কনফারেন্স। তার প্রতিষ্ঠিত আর কয়েকটি শিল্প প্রতিষ্ঠান হলো -

১) বেঙ্গল এনামেল ওয়ার্কস

২) ন্যাশনাল ট্যানারি ওয়ার্কস

৩) ক্যালকাটা পটারী ওয়ার্কস

৪) আর্যবীমা কোম্পানি (দুঃস্থ পরিবার রক্ষার্থে)

৫) বেঙ্গ সল্ট কোম্পানি

৬) প্রফুল্ল চন্দ্র কটন মিল (পরবর্তীতে খুলনা টেক্সটাইল মিল)

১৯১৬ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে স্বেচ্ছা অবসরের পর তিনি যোগ দিলেন সদ্য প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সায়েন্স কলেজে।নতুন এই প্রতিষ্ঠানে রসায়নের গবেষণা ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পড়ানোর দায়িত্ব নিয়ে নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করেন তিনি। ব্রিটিশ সরকারের " নাইট হুড' সম্মান প্রদানের পর তিনি স্যার পিসিরায় হিসেবে পরিচিত হন। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে ইন্ডিয়ান কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। তিনি ইন্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটির প্রথম প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আনুষ্ঠানিক ভাবে অবসর গ্রহণ করলেও আমৃত্যু তিনি অধ্যাপনার কাজ চালিয়ে গেছেন।

শিক্ষক ও শিক্ষা সম্প্রসারণে আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের অবদানঃ

আচার্য রায় শুধু বাঙালি জাতিকে অর্থনীতির মুক্তির পথের সন্ধান দেন নি তাদের কে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য আদর্শ ও জ্ঞানী শিক্ষক গড়ে তোলার প্রতি ও বেশ মনোনিবেশ করেছিলেন। শিক্ষা বিস্তারের জন্য ও প্রতিষ্ঠা করেন বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। " The congress of the universities of the empire'- এ ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দে যোগদান করে উচ্চ শিক্ষার মান বাড়ানোর জন্য ভারতে আরও মানসম্মত নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবী করেন। নারী শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষা সম্প্রসারণে তিনি আর্থিক সাহায্য করেছিলেন। বাগেরহাটে কলেজ প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখেন তিনি এবং কলেজ টি ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে তার নামে (পিসি কলেজ) রাখা হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণ করার সময় তার সঞ্চিত প্রায় ১০ লাখ টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে দান করেন। ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি তার পৈর্তৃক বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত করেন আর.কে.বি.কে হরিশ্চন্দ্র ইনস্টিটিউশন। যেটি শিক্ষা বিস্তারে বেশ ভূমিকা রাখে। নিজের গ্রামে পিতার প্রতিষ্ঠিত দেশের প্রথম বালিকা বিদ্যালয় "ভুবনমোহিনী বালিকা বিদ্যালয়'-এ তিনি সাহায্য করেন। বাগেরহাটে পিসি কলেজ,সাতক্ষীরায় "চাম্পাফুল আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় মাধ্যমিক বিদ্যাপীঠ',খুলনার এপিসি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় তার অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত হয়। বি.এল কলেজ, দৌলতপুর, খুলনা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কার মাইকেল মেডিকেল কলেজ, অশ্বিনী কুমার ইনস্টিটিউশন, বরিশাল, যাদবপুর হাসপাতাল, চিত্ত রঞ্জন ক্যান্সার হাসপাতাল সহ প্রায় অর্ধ শতাধিক প্রতিষ্ঠানে তিনি আর্থিক অনুদান দিয়েছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ১ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা দান করেন। শিক্ষা বিস্তারে তিনি ছিলেন নিবেদিত প্রাণ। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জমিদারির সম্পতি ও তার নিজের উপার্জিত সমূদয় সম্পতি শিক্ষা

প্রতিষ্ঠান,ছাত্র বৃত্তি ও জনহিতকর কাজে ব্যয় করে গেছেন। বলা যায়, ঐ সময়ে প্রতিষ্ঠিত সকল প্রতিষ্ঠানে তার আর্থিক অনুদানের বিষয়টি অস্বীকার করার মত নয়।

বিজ্ঞানী হিসেবে পিসি রায়ের প্রাপ্তিঃ

পি.সি রায়ের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি আচার্য উপাধি যা তিনি শিক্ষকতার জন্য উপার্জন করেছিলেন। ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে এডিন বার্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ডি. এস. সি ডিগ্রি লাভ করেন এবং এর জন্য ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে" হোপ প্রাইজ' বৃত্তি লাভ করেন। বৃটিশ সরকার তাকে কম্পানিয়ন অব দি ইন্ডিয়ান এম্পায়ার উপাধি লাভ করেন।কম বেশি রসায়ন বিজ্ঞানী মহলে তিনি "Mastet of nitarites' নামে খ্যাত ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,মহীশুর বিশ্ববিদ্যালয়, বেনারসি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সদস্য হিসেবে তৃতীয় বারের মত ইংল্যান্ড যান এবং সেখান থেকেই সি আই উপাধি লাভ করেন। ১৯১৯ সালে বৃটিশ সরকার তাকে নাইট উপাধি দেন। বৃটিশ সরকারের নাইট হুড সম্মান প্রাপ্তির পর তিনি স্যার পি.সি.রায় উপাধি লাভ করেন।

অনাড়ম্বর জীবন যাপনঃ

আচার্য রায়ের জীবন ছিল একেবারে সাধারণ, আটপৌরে। অনাড়ম্বর জীবনে অভ্যস্ত লোকটি নিজের কাজ নিজেই করতেন। আরাম আয়াশী জীবন তার পছন্দের নয়। শোবার ঘর আর খাওয়ার ঘর ছিল একটাই। চার পায়া একটি টেবিল, একটা টুল, একটা স্টোভ,কিছু বাসন পত্র,জামা কাপড় রাখার একটা আলনা। একেবারে সাধারণ রান্না তা পছন্দের। জল খাবারে চিড়ে,মুড়ি,খই ও নারকেল কোরা পছন্দ করতেন। নারকেলের নাড়ু তার খুব প্রিয় ছিল। নিজের কাপড় নিজেই কাচতেন, একই থান কিনে নিজের এবং ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্টের জন্য কোট বানাতেন।

আচার্য রায় ভোজন প্রিয় ব্যক্তি ছিলেন না।অতি প্রত্যুষে এক পোয়া খাঁটি দুধ পেলে খুশি হতেন এর সঙ্গে অর্ধ সিদ্ধ মুরগির ডিম ও পাউরুটি খেতেন। দুপুরে খেতেন হালকা পাকের রান্না, মসল্লা যুক্ত তরকারি রান্না নিষেধ ছিল। সন্ধ্যার পর আলু পেঁয়াজের সাথে দুখানা লুচি তার খুব পছন্দের ছিল। " চা পান না বিষ পান' তাই চা খুব একটা পান করতেন না।অবশ্য কর্ম ক্লান্তিতে ভাল মানের এক কাপ চা তিনি খেতেন। তিনি বিলাস -ব্যসন, নামী আসন আর দামী দামী পোশাকের প্রতি কখনও আকৃষ্ট ছিলেন না। আচার্য রায়ের এক ছাত্র যিনি পরবর্তীতে অধ্যাপক হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন তিনি প্রথম দিন ক্লাসে এসে লক্ষ্য করলেন,যে বেয়ারাটি একটু আগে রেজিস্ট্রার খাতা নিয়ে ক্লাসে এসেছিলেন যে কোট পরে সেই একই কোট পরে ক্লাসে ঢুকলেন আচার্য রায় ক্লাসে ঢুকলেন ক্লাস নিতে যা দেখে ছাত্র টি ভেবেছিলেন স্যার হয়তো ভুল করে বেয়ারার কোট পরে এসেছেন। তার ভুল ভাঙে যখন জানতে পারে বেয়ারা এবং তার কোট একই কাপড়ে তৈরি ।তিনি মানুষ কে এভাবেই মূল্যায়ণ করতেন।

সাধারণ পোশাকের কারণে অনেক বারই এভাবে বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হয়েছে। একবার এক বিদেশি ডঃপি.সি. রায় কে দেখার জন্য আসেন,বহু কষ্টে তিনি রায় মহাশয়ের বাহির আঙ্গিনায় এসে দেখেন খালি

গায়ে,খালি পায়ে,হাঁটু পর্যন্ত স্বদেশী থান আর ঝড়ো হাওয়ায় দুমড়ানো মাথার চুলওয়ালা বিজ্ঞানী কে বাড়ির কর্মচারী ভেবে লাগেজটি হাতে দিয়ে বিজ্ঞানীর সাথে দেখা করার অভিলাষ ব্যক্ত করেন। পরবর্তীতে যখন জানতে পারেন লাগেজ হাতে ঐ ব্যক্তিই আর কেউ নন উনিই স্যার পি.সি.রায় তখন তিনি লজ্জায় লাল হয়ে যান। আরেক দিন এক নবাগত ছাত্র আচার্য রায় কে চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী ভেবে এক গ্লাস জল খেতে চায় তিনি স্মিত হেসে তাকে জল এনে দিলেন এবং ছাত্র টির ইচ্ছা পূরণ করার জন্য তাকে কলেজ ক্যাম্পাস ঘুরে দেখালেন। নবাগত ছাত্রটি যখন স্যারের পরিচয় জানতে পারলো তখন তার পা ধরে ক্ষমা ভিক্ষা করলে তিনি বললেন,"এবার যখন চিনলে আর তো ভুল হবে না'।এ রকম আরও বহু ঘটনা আছে।তবে তিনি নিয়মানুবর্তী ছিলেন। জ্ঞান ও পরামর্শ প্রদানে কখনও ক্লান্ত বা বিরক্ত হতেন না। অপচয় কারীকে কখনও পছন্দ করতেন না। একবার এক ইঞ্জিনিয়ার ডাব খেয়ে ডাবের শাসসুদ্ধ ডাবটি ফেলে দিলে তিনি তার গালে একটি চড় মেরে বললেন "নবাবী করলে? ভিতরে যে শাস ছিল।'ইঞ্জিনিয়ার তার ভুল বুঝতে পেরে দোষ স্বীকার করেন।তিনি ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার সতীশ চন্দ্র সেন। আচার্য রায় ছিলেন আলোকবর্তিকা। আলো ছড়িয়েছেন সারা পৃথিবীতে। ব্যক্তি জীবনে তিনি অবিবাহিত ছিলেন।

সাহিত্য প্রেমিক ও তার রচিত গ্রন্থ সমূহঃ

জগৎ বিখ্যাত বাঙালি আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় শুধু রসায়ন নিয়েই গবেষণা করেন নি সাহিত্যের প্রতি ও তার অনুরাগ ছিল। তার অন্যতম প্রিয় লেখক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ নাথ ঠাকুর এবং উইলিয়াম শেক্সপিয়ার। রবীন্দ্রনাথ ও তিনি ছিলেন সমবয়সী যদি ও কবি তিন মাসের বড় ছিলেন। সাহিত্য, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে গঠিত সংগঠনের সাথে তিনি জড়িত হয়েছেন। নিজেও সংঘটন তৈরি করেছেন। তিনি বিভিন্ন সময়ে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে গুরুত্বপূর্ণ পদে থেকে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি বিজ্ঞান গ্রন্থের পাশাপাশি সমাজ,সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস বিষয় নিয়ে বহু প্রবন্ধ বা নিবন্ধ লিখেছেন যা বিভিন্ন সমসাময়িক পত্র পত্রিকায় হয়েছে। রবী ঠাকুরের সাথে তার চমৎকার পত্র বিনিময় হতো।" হিন্দু রসায়ন শাস্ত্রের ইতিহাস 'গ্রন্থে তার অনবদ্য লেখনির পরিচয় পাওয়া যায় এবং সমগ্র পৃথিবীর বিজ্ঞানী সমাজে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। তার অনেক গ্রন্থে সরাসরি সাহিত্যের বিষয়বস্তু না থাকলেও তার রচনা ছিল সাহিত্য গুণ সম্পন্ন। বাংলায় রচিত ওার প্রবন্ধের সংখ্যা একশতের মতো। তার রচিত গ্রন্থঃ মিথ্যার সহিত আপোষ ও শান্তি ক্রয়, প্রাচীন ভারতে রসায়ন চর্চা, অধ্যয়ন ও সাধনা, অন্ন সমস্যা, অন্ন সমস্যায় বাঙালির পরাজয় ও তাহার প্রতিকার, বিশ্ববিদ্যালয়ে সার্টিফিকেট ও শিল্প ব্যবসায়ে কৃতিত্ব লাভ, হিন্দু রসায়নী বিদ্যা,সরল প্রাণিবিজ্ঞান, আত্মচরিত (১ম ও২য় খন্ড), আচার্য বাণী চয়ন এছাড়াও ইংরেজি ভাষায় অনেক গুলো গ্রন্থ রচনা করেছেন। মধুসূূদনের সাথে তার জীবনের অনেক গুলি ঘটনার মিল আছে। মধুসূদনের মামার বাড়ী ছিল আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের গ্রামের বাড়িতে। মধুসূদন প্রভাব তার উপর পরিলক্ষিত। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের সাথে তার গভীর সখ্যতা ছিল। এই দুই মনীষী সাম্প্রদায়িকতাকে মনে প্রাণে ঘৃণা করতেন। উভয়ই ইসলামের ভ্রাতৃত্ববোধে উদ্বুদ্ধ ছিলেন। দু'জনই বিপ্লবের অগ্নি মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। দু'জনের লেখার মধ্যে ছিল স্বাদেশিকতা।বিজ্ঞানী নজরুল কে বলছিলেন, "তুমিই পারো সাহিত্যের মাধ্যমে স্বাধীনতার পতাকা আনতে। 'মূলত নজরুল তা পেরেছিলেন। দূজনই চেয়েছিলেন

সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ, বর্ণবিদ্বেষের বিষাক্ত হনাহানি থেকে আর শোষণের পৃথিবীকে দলবাজির রাজনীতি থেকে মুক্ত করে মানবপ্রেমের বহ্নি শিখা জ্বালাতে।

স্বাধীনতা সংগ্রামে তার ভূমিকাঃ

দেশমাতৃকার পায়ের বেড়ি কষ্ট দিত তাকে।পরাধীন ভারতবর্ষের দুঃখমোচনের জন্য তিনি দিন রাত ভাবতেন। পরাধীন ভারতবর্ষে স্বাধীনতা না এলে মানুষ নিজের পায়ে দাঁড়াতে পাররে না,আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও সম্ভব নয় এই চিন্তা তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াতো। অধ্যাপনার মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের বীজ বপন করতেন ছাত্রদের মধ্যে। ১৯১৯ সালের রাউলাট অ্যাক্টের বিরুদ্ধে টাউন হলের প্রতিবাদ সভায় তিনি বলেছিলেন, "আজ ভারত মাতাকে যে নতুন শৃঙ্খলে জড়িয়ে ফেলা হয়েছে, আজ তার সন্তানদের উপর যে জুলুমবাজি এসেছে তার তীব্র প্রতিবাদ জানানোর জন্য আমার মতো একজন বৈজ্ঞানিকেও গবেষণাগারের টেস্ট টিউব ছেড়ে আসার প্রয়োজন হচ্ছে। "" Science can wait but swaraj cannot. "অসহযোগ আন্দোলনের সময় নেতারা যখন কারারুদ্ধ তখন চিত্তরঞ্জন দাসের পত্নী বাসন্তী দেবীর অনুরোধে তিনি বাংলার প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করেছিলেন বেল গাঁওতে কংগ্রেসের অধিবেশনে। ছাত্রাবস্থা থেকে স্বদেশ স্বাধীনতার স্বপ্ন তাকে তাড়া করে বেড়াতো, মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তা অটুট ছিল।

জীবনের শেষ দিনগুলোঃ

১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দের ২১শে মে জ্বরে আক্রান্ত হলে চিকিৎসক নিউমোনিয়া বলে মত প্রকাশ করেন। ১৬ই জুন তার অবস্থার আরও খারাপ হয়। বিকাল ৪টায় শেষ বারের মত বিধান চন্দ্র রায় তাকে দেখে আসেন। ব্যক্তি গত জীবনে অবিবাহিত এই মহান বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী স্যার আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় ১৯৪৪ সালের ১৬ই জুন ৮৩ বছর বয়সে বাংলার অগণিত জনতাকে গভীর শোকের সাগরে ভাসিয়ে না ফেরার দেশে পাড়ি জমান।

সুপারিশঃ

আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের জন্ম স্থান খুলনা জেলার পাইকগাছা উপজেলার রাড়ুলী গ্রামে। আমার পরম সৌভাগ্য আমিও ঐ একই উপজেলার বাসিন্দা। প্রতি বছর স্যারের স্মরণে বিশেষ অনুষ্ঠান করা হয় গণ্যমান্যব্যক্তিবর্গ, এমপি ও মন্ত্রীবর্গদের নিয়ে। তার পৈতৃক বাড়ি রক্ষা করে তার প্রতিষ্ঠিত সমবায় ব্যাংক টি আশু সংস্কার একান্ত প্রয়োজন। জগৎ বিখ্যাত স্যার পি.সি.রায়ের স্মৃতি রক্ষার্থে স্যার পি.সি.রায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য অনেক মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। খুলনা জেলার পাইকগাছা উপজেলায় যদি এই বিশ্ববিদ্যালয় টি প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তার সম্পর্কে আরও অনেক কিছু জানতে সক্ষম হবে।

উপসংহারঃ

বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় রসায়ন গবেষণায় যে পথ তৈরি করে গেছেন প্রজন্মের পর প্রজন্ম সেই পথে হাঁটছে, সে পথ আরও বিস্তৃত হয়েছে। একজন খ্যাতিমান বৈজ্ঞানিক হয়েও বিচিত্র জীবন ধারাকে তিনি

গ্রহন করেছিলেন। বাঙালীকে সাবলম্বী করার জন্য তিনি বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন।শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি সকল ক্ষেত্রে তিনি এগিয়ে গেছেন। তিনি বিজ্ঞান চেতনার বিস্তার, শিল্পের উৎকর্ষ এবং দেশের অর্থনৈতিক দূর্দশা মোচনের জন্য বেশির ভাগ সময় কাটিয়েছেন।

লেখক পরিচিতি:

অনিল কৃষ্ণ সানা বাংলাদেশের ঝালকাঠি জেলার রাজাপুর উপজেলার রাজাপুর টেকনিক্যাল এন্ড বিএম কলেজে বাংলা প্রভাষক হিসেবে কর্মরত আছেন।তার লেখা বিভিন্ন গবেষণা ধর্মী প্রবন্ধ,ছোটগল্প,কবিতা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে।